



Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)

A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture

Volume - vi, Issue - iii, Published on July issue 2026, Page No. 123 - 130

Website: <https://tirj.org.in/tirj>, Mail ID: editor@tirj.org.in

(SJIF) Impact Factor 8.111, e ISSN : 2583 - 0848

‘অকাল বসন্ত’ - বসন্তের অকাল মৃত্যু

রুদ্রদেব মন্ডল

বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, স্টেট এডেড কলেজ টিচার (SACT-1)

রাজা বীরেন্দ্র চন্দ্র কলেজ, কান্দি, মুর্শিদাবাদ

Email ID: devrudra1991@gmail.com



Received Date 15. 06. 2026

Selection Date 15. 07. 2026

Keyword

Life is truth,
unceasing
struggle,
lamentation,
loneliness,
organic instincts,
premature spring,
dormant desires,
unfulfillment, and
relentless clashes.

Abstract

‘Where shall I find him?’ — the one in whose voice resonates the melody of the indefinite. He is that Neelkantha who can undertake the journey In Search of the Nectar Pitcher (Amritakumbher Sandhane). Through this journey in search of the nectar pitcher, he realized that “the organization is not the ultimate truth; life itself is the real truth.” The eminent literary critic Saroj Bandyopadhyay observed - “What distinguished Samaresh from other leftist writers was that he realized that the organization was not the ultimate truth; life itself was his true goal.”

This truth of life became the master key to his literary works. In response to a question from Leela Roy, Samaresh Basu said: “I write in order to understand life.”

The expansion of Samaresh Basu’s understanding of life and the world began with his entry into political life. After coming into contact with Satyaprasanna Dasgupta, he became associated with the Communist Party, which broadened his experiences of life. Later, following internal party debates over revolutionary ideology and methods, his imprisonment in the 1950s, and the subsequent loss of both his party membership and his job as a tracer in an arms factory, the direction of his life changed significantly. As a result, he devoted himself entirely to the world of literature.

The colorful complexities of life found vivid expression in Samaresh Basu’s own life. Therefore, he could confidently state: “Life is greater than literature. A writer need not undergo profound practice to realize this truth, for life itself is perpetually vibrant.”

Standing at the very heart of life, he created literature by blending emotional sensitivity with a profound consciousness of existence. At the core of his writings lie humanism and self-awareness. Hence, he declared: “I write to know myself. One who does not know oneself—how can one understand the language of others?”

His self-awareness and life experiences gradually became the foundation of his literary world. The settings of his stories were occupied by the lower strata of life in the jute mills and industrial belts. As one critic remarks: “In the socio-economic crisis that intensified under the post-1947

political order, Samareesh closely observed the lives of people in the suburban industrial regions. His residence in slums, employment in a rifle factory, and political association with jute-mill workers enabled him to know these people intimately.”

The crowded slums with thatched roofs, the dockside labour lines, and the gloomy lower-middle-class households—lives long buried beneath a haze of smoke and greyness—were presented by him in his own distinctive style. Although he had mastered the art of storytelling in childhood by listening to his mother narrate Brata Katha (ritual tales), he gave a unique literary form to humanity’s relentless struggle for survival. One such story of this unending struggle for existence is ‘Akal Basanta’ (Untimely Spring).

Discussion

‘কোথায় পাব তারে’ এই অনির্দিষ্টের সুর যার কণ্ঠে ধ্বনিত হয় তিনিই সেই নীলকণ্ঠ যিনি ‘অমৃতকুন্ডের সন্ধান’ যাত্রা করতে পারেন। আর সেই অমৃতকুন্ডের সন্ধান যাত্রা করেই তিনি উপলব্ধি করেছেন ‘সংঘ সত্য নয়, জীবন সত্যই আসল সত্য’। বিশিষ্ট সাহিত্যিক সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেছেন –

“অন্য বামপন্থী লেখকের সঙ্গে সমরেশের পার্থক্য এখানে যে, সমরেশ জেনেছিলেন যে, সংঘ সত্য নয়, জীবন সত্যই তাঁর লক্ষ্য।”^১

সেই জীবন সত্যই তার লেখার মূল চাবিকাঠি। লীলা রায়কে এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি বলেছিলেন –

“লিখি জীবনকে জানার জন্য।”^২

সমরেশ বসুর জীবন ও জগৎ সম্পর্কে ব্যাপ্তির সূত্রপাত রাজনৈতিক জীবনে প্রবেশের মাধ্যমে। সত্যপ্রসন্ন দাশগুপ্তের সান্নিধ্য লাভের পর কমিউনিস্ট পার্টির সংস্পর্শে এসে জীবনের অভিজ্ঞতা লাভের ব্যাপ্তি ঘটে। পরবর্তীকালে বিপ্লবের পন্থা ও পদ্ধতি নিয়ে অন্তর্দলীয় তর্কবিতর্কের পরিণামে পঞ্চাশের কারাবাস এবং রাজনৈতিক সদস্যপদ ও অস্ত্র কারখানার ট্রেসারের চাকরি হারানোর পর তার জীবনযাত্রার অভিমুখ পরিবর্তিত হয়। ফলস্বরূপ নিজেকে পুরোপুরি আত্মবিনিয়োগ করেন সাহিত্য জগতে।

জীবনের বর্ণবহুল জটিলতা সমরেশের ব্যক্তি জীবনকে নানা বর্ণে ব্যক্ত করেছে। তাই তিনি সাবলীলভাবে বলতে পেরেছেন –

“সাহিত্যের থেকে জীবন বড়, এ সত্যের জন্য সাহিত্যিককে গভীর অনুশীলন করতে হয় না। তা সত্যই অতি জীবন্ত।”^৩

জীবনের মূলস্রোতে দাঁড়িয়ে তিনি তার হৃদয়বেগ ও জীবনচেতনার সংযোগে যে সাহিত্য সৃষ্টি করেছেন তার মূলে আছে মানবপ্রেম ও আত্মচেতনা। তাই তিনি বলতে পারেন –

“নিজেকে জানার জন্য লিখি, যে নিজেকে জানে না, সে বুঝবে কি করে অপরের ভাষা?”^৪

তার সেই আত্মচেতনা ও জীবন অভিজ্ঞতাই সাহিত্যের ভূমি দখল করছিল। তাঁর গল্পের ভূমি দখল করলো পাটকল, চটকলকেন্দ্রিক শিল্পাঞ্চলের নিচেতলার জীবন।

“৪৭-পরবর্তী নয়া শাসনে ক্রমবর্ধমান সমাজ অর্থনীতির সংকটে ক্লিষ্ট মানুষকে সমরেশ দেখেছেন মফঃস্বলী শিল্পাঞ্চলের জীবনপটে অত্যন্ত কাছের থেকে। সাহিত্যিক জীবনের উষ্ণবৃত্তি, বস্তিবাস, রাইফেল ফ্যাক্টারিতে চাকরি, চটকল কর্মীদের সঙ্গে রাজনৈতিক যোগাযোগ সূত্রে এই মানুষগুলি তাঁর জানা ও চেনা।”^৫

খাপড়া চালের ঘিঞ্জি বস্তি জেটির কুলিলাইন বিমর্ষ নিম্নমধ্যবিত্ত গেরস্থালি যা বুক চাপা ধোঁয়াশা ও ধূসরতায় চিরকালের মতো অবলুপ্ত ছিল; সেই জীবন বৈচিত্র্যকেই তিনি পরিবেশন করলেন নিজস্ব রীতিতে। যদিও তিনি সেই গল্প বলার শিল্প

রীতি আয়ত্ত করেছিলেন শৈশবেই মায়ের কাছে ব্রত কথার কাহিনী শুনে শুনে। তবুও মানুষের টিকে থাকার বিরামহীন সংগ্রামকে তিনি রূপদান করেছেন নিজস্ব রীতিতে। এইরকমই এক টিকে থাকার বিরামহীন সংগ্রামের গল্প ‘অকাল বসন্ত’।

মানুষের মনুষ্যত্বের সন্ধান অর্থে তিনি বুঝেছিলেন টিকে থাকার বিরামহীন সংগ্রামকেই। সেই বিরামহীন সংগ্রামই প্রত্যক্ষ কখনও বা পরোক্ষভাবে তার গল্পের ভূমি দখল করেছে। প্রথম থেকেই তিনি বুঝেছিলেন –

“ধ্যান নাই, উপাসনা নাই। তাই এমন ক্রন্দন নাই; নির্গন্ত নাই, তীর্থংকর নাই। দেব নাই, দেবী নাই।

মরুভূমিও নাই। পরলোকও নাই। এ সকলই কল্পনা। আছে এক ধর্ম, মনুষ্য ধর্ম।”^৬

সেই মানবতার দাবিতে মানুষের যে বাঁচার অধিকারটুকু থাকে তার উপায়ের ও দাবির জন্যই যারা সংগ্রাম করে তাদের কথাই সমরেশ বসু স্পষ্ট করে তার সাহিত্যে চিত্রায়িত করেছেন।

“সমরেশ বসুর ছোটগল্পের জগতে নিবিষ্ট পাঠক অনুভব করবেন, কখনও কখনও আমাদের জীবনের উঁচু মহলের দিয়ে তাঁর মন গেলেও মূল ধারাটা একেবারেই এ সমাজের অবতলের অভিমুখ। সেই অবতলে তাঁর মন ফিরে যায় যেখানে মানুষের নেই কোনো নির্দিষ্ট নিশ্চিত জীবিকা, মানুষ উন্মত্তজীবী, প্রতিবাদের তার কোনো ভাষা নেই। অবধারিত দুঃস্থতা মেনেই নেয় তারা প্রায় প্রতিকারহীন বিধিলিপির মতো...”^৭

কারণ যে প্রেক্ষাপটে সমরেশ বসুর সাহিত্যের জগতে আবির্ভাব সেই চল্লিশের দশক ছিল এক ভয়াবহ বিপর্যয়ের সময়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন বাংলার সমস্ত আকাশ বাতাস এবং এক অদৃশ্য গরল সমাজের কোষে কোষে সঞ্চারিত (সেই গরল অবশ্যই সাম্রাজ্যবাদী শক্তির চক্রান্তের ফসল)। সেই বিষের প্রভাবেই গৃহহারা, অন্নহারা মানুষ মানবিক মূল্যবোধ বিসর্জন দিয়ে টিকে থাকার সংগ্রামে অবিরাম লড়াই করে চলেছে। আমাদের আলোচ্য ‘অকাল বসন্ত’ গল্প সেই রকম একটি অবিরাম সংগ্রামের গল্প।

আলোচ্য ‘অকাল বসন্ত’ গল্পে গল্পকার দেখিয়েছেন টিকে থাকার সংগ্রামে রত মানুষের জীবনেও বসন্ত আসে, কিন্তু তা অবশ্যই অকাল বসন্ত এবং সেই বসন্ত অকালেই ঝরে পড়ে। গল্পে উল্লিখিত চরিত্রগুলির মনে বসন্তের ছোপ লাগতে শুরু করেছিল অকাল বসন্তেই এবং সেই বসন্তের অকাল মৃত্যু ঘটেছে বসন্তের পটভূমিকায়। এখানেই গল্পের দ্যোতনা। আমরা আলোচ্য প্রবন্ধে ‘অকাল বসন্ত’ গল্পে কিভাবে বসন্তের পটভূমিকায় বসন্তের অকাল মৃত্যু ঘটেছে সেটাই পর্যালোচনা করে দেখব; সেই সঙ্গে আমরা পর্যালোচনা করে দেখব গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের জীবনে যে বসন্ত এসেছে সময় বা পরিস্থিতির বিচারে তাও অকাল বসন্তে পরিণত হয়েছে কিনা।

আলোচ্য ‘অকাল বসন্ত’ গল্পের সূচনা ঘটছে শরতের শুরুতেই এবং বসন্তের আগমন বার্তা দিয়েই গল্পের সমাপ্তি ঘটছে। গল্পের সূচনাতেই গল্পকার বলেছেন –

“যায় যায় করে তবু বর্ষা এখনো যেতে পারেনি। তার কালো মুখের ছায়া টুকরো টুকরো মেঘের আকারে ছড়িয়ে আছে আকাশে। পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়েছে সেই মেঘের গায়ে।”^৮

এখানে রয়েছে গভীর ব্যঙ্গনা। কালো মুখের ছায়া ছড়িয়ে আছে আকাশে - এ যেন দিগন্তবিস্তৃত যুগযজ্ঞা। সেই যুগযজ্ঞা প্রকট হয়ে ওঠে যখন গল্পের শুরুতেই অভয় অবহেলায় অবলীলায় বলে –

“মানুষের প্রাণ! খুড়ো একদিন মানুষ ছিলাম। এখন ওসব বালাই নেই।”^৯

সমাজ অর্থনীতির সংকটে ক্লিষ্ট আলোচ্য গল্পের চরিত্রগুলি যুগযজ্ঞার অবধারিত দুঃস্থতা প্রতিকারহীন বিধিলিপির মতোই মেনে নিয়েছে। কিন্তু তাদের জীবনেও মেঘের গায়ে পড়ন্ত বেলার সোনালী আলো পড়ার মতোই হঠাৎ আশার আলো ঝলকানি দিয়ে ওঠে, অভয়ের অভয় পদে আগমনের মধ্যে দিয়ে। আর সেই আলোর ঝলক চোখের পলকেই মিলিয়ে যায়, তারপরই নেমে আসে গভীর অন্ধকার। প্রত্যেকটি চরিত্র হতাশার গভীর অন্ধকারে ডুব দেয়। গল্পকার সে কথাও সুকৌশলে জানিয়েছেন –

“যেন একটা অসহ্য গুমোট অস্থিরতার মধ্যে হাসিটা মুক্তির সন্ধান খোঁজে কিন্তু হাসিটা শেষ হয়ে আবার সেই অস্থিরতায় দলা পাকিয়ে ওঠে।”^{১০}

মাত্র ছয় মাসের পরিসরে সংগঠিত এই কাহিনীর অন্তরালে গল্পকার যুগ যুগান্তরের বঞ্চিত মানুষের সঞ্চিত ব্যথাকে উপস্থাপন করেছেন।

সমরেশ বসু কখনই অবচেতনের উৎস সন্ধানের ধূসর কুটিল পথে পা বাড়িয়ে পাঠককে মনস্তাত্ত্বিক জটিলতার ভুলভুলাইয়ায় দিশেহারা করেননি। অতি সাধারণ একটি ঘটনা অভয়ের আসা এবং যাওয়ার মাঝের পরিসরে সংঘটিত ঘটনার আশ্রয়ে প্রত্যেকটি চরিত্রের মানসিক দ্বন্দ্বকে তিনি প্রাণময় জীবন্ত রূপদান করেছেন। কারণ প্রত্যেকটি চরিত্রই তার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ভূমি থেকে আমন্ত্রিত। প্রকৃতিতে যখন বসন্তের পটভূমিকা তখন প্রত্যেকটি চরিত্রের অন্তরে গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহ আর সেই অন্তর জ্বালার হলকা বাতাস বহির্গমনের উপায় না পেলে বুকের মাঝেই চলতে থাকে তার গুমরাণি। সেই চাপা আগুনের পোড়ানিতে প্রত্যেক চরিত্রের অন্তরজ্বালা জ্বলন্ত রূপ লাভ করেছে লেখকের লেখনীতে। সেই অন্তরের চাপা আগুন কখনো কখনো বাষ্প আকারে দীর্ঘশ্বাস হয়ে বেরিয়ে আসে।

“বনের আগুন সবাই দেখে,
মনের আগুন কেউ না দেখে,
সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।”^{১১}

বিনি টুনিদের কণ্ঠে ঝরে পড়া সেই চাপা আগুনের পোড়ানিতে এই বিশ্বসংসার দিশেহারা।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভয় পদ, জীবনের প্রতি পদক্ষেপে বাধা প্রাপ্ত। এক অদৃশ্য লক্ষণ রেখা গল্পের নায়ককে এক নির্দিষ্ট বৃত্তে প্রতিস্থাপন করেছে। অথচ সেই চরিত্রের নাম অভয়পদ। নামেই ব্যঙ্গনা। বিনিদের কণ্ঠে ঝরে পড়া চাপা আগুনে সবচেয়ে বেশি দগ্ধ চরিত্র আলোচ্য গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভয়পদ। আলোচ্য গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের বুক জ্বলন্ত আগুনের ছবি গল্পকার এঁকেছেন। প্রত্যেকটি চরিত্রের বুকের আগুন একমুখী ধারায় প্রবাহিত হলেও কেবল অভয়ের বুক জ্বলন্ত সেই অগ্নিশিখা দ্বিমুখী ধারায় প্রবাহিত। একদিকে রয়েছে কামনা বাসনার আগুন, অন্যদিকে দায়িত্ববোধে দগ্ধিত চরিত্র অভয়পদ। পুরুষের শক্ত বুক ফাটে, তবু মুখ ফোটে না। সে নিজেকে নিজের কাছ থেকে এড়াবার জন্যই পালিয়ে বেড়ায়।

“বোধ করি সেই নিঃশ্বাসটা ফেলবার জন্যই সেই ভোরবেলা বেরিয়ে যায় ফেরে সেই রাতে।”^{১২}

তবু মুক্তি মেলে না, মোহ মায়ায় জড়িয়ে পড়ে। গল্পকার তার সেই অন্তর্দ্বন্দ্বকে সুনিপুন ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন –

“ধিকিধিকি আগুন জ্বলে যেন অভয়ের বুকো। ভাবে, পিছুবে। কিন্তু পিছিয়েও সামনে এগোয়।”^{১৩}

সামনে এগোনোর আকর্ষণ যে অভয়ের মধ্যে লুকিয়ে ছিল তা অভয়ের কার্যকলাপের মধ্যেই আভাসিত। নতুন বাসস্থানের অতিকায় ভূতের মত নির্জন ঘরটার অন্ধকার কোলে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ অভয় মানুষের সান্নিধ্য লাভের আকাঙ্ক্ষায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে। সেই সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষা অবশ্যই প্রিয়জনের। সেজন্যই তিন বোনের বেলোয়ারি চুড়ির রিনিঠিনি শব্দ, পায়ের টিপটিপ শব্দ, বাসন ধোয়ার আওয়াজ কিংবা চাপা হাসির আভাস পেতে “অন্ধকারে যতই কিম মেরে পড়ে থাকুক, অভয়ের কান দুটো যেন হাঁ করে থাকে।”^{১৪}

গভীর হতাশার অন্ধকারে অভয়ও একটুকরো আশার আলো, দক্ষিণের হাওয়া মাখতে চেয়েছিল। সেই জন্যই দক্ষিণের জানালা দিয়ে আলো এসে অভয়ের গায়ে পড়ে এটা জানার পরেও সে দক্ষিণে জানলা খোলা রাখে এবং ছেলে মানুষের মত মটকা মেরে পড়ে অনুভব করে তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি আটকে আছে তার গায়ের মধ্যে। অভয় নিজেকে আর নিজের থেকে এড়িয়ে রাখতে পারে না। অন্তরের সুপ্ত কামনার টানে রোজই অভয় ফিরে আসে বিকেলের ছুটির পর। আসবো না করেও আসে। এখানেই অভয় চরিত্রের অন্তর দ্বন্দ্ব। মানুষের সান্নিধ্য লাভের ফলে অভয়ের বুকের একটা দরজা খুলে যায়। সেখানে অব্যাহত বসন্তের হাওয়া প্রবেশ করে, অভয়ের মনটা ভোর হয়ে আসে। কিন্তু সেই বসন্ত অকাল বসন্ত; অকালেই আসে, অকালেই ঝরে পড়ে। নতুন গড়া এক ভরা সংসারে যখন চারটে মানুষ আকণ্ঠ ডুবে আছে ঠিক তখনই আসে বদলির নির্দেশ। শুরু হয় অভয়ের অন্তরের দ্বন্দ্ব। পরিবারের প্রতি কর্তব্যের খাতিরে কর্মের তাগিদে নতুন জায়গায় এসে যে নতুন দায়িত্ববোধে অভয় জড়িয়ে পড়ে তা ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়া অভয়ের পক্ষে দুঃসহ হয়ে ওঠে। বিবেকের দংশনে দংশিত এক চরিত্র অভয়। সে ভাবে –

“সব যায় যাক তবু পারবো না ছেড়ে যেতে, পারবো না এমনি করে ভাসিয়ে দিতে। কিন্তু পরমহুঁতেরই মনে পড়ে মায়ের কথা, ভাই বোনগুলির বুভুক্ষু শুকনো মুখ।”^{১৫}

তাই শেষ পর্যন্ত কর্তব্যের জোয়ারের টানে অভয় যখন ভাসমান তার অপর কূলে তখন ভাঁটার টান।

“যে নিঃশ্বাসটা আটকে ছিল বুকের মধ্যে সেটা আর বেরিয়ে আসবার পথ পেল না। বুকের মধ্যেই ছটফট করে মরতে লাগলো।”^{১৬}

গল্পের সূচনা লগ্নে অভয় সম্পর্কে গল্পকারের এই উক্তি সমগ্র গল্প জুড়েই তাৎপর্যবাহী হয়ে উঠেছে। যে নিঃশ্বাসটা ফেলার জন্য তাকে পালিয়ে বেড়াতে হত, সেখান থেকে তার মুক্তি মেলেনি গল্পের পরিশেষেও। সেই নিঃশ্বাসটা ফেলার জন্য তাকে আবার পালিয়ে বেড়াতে হল। অভয় মাঝ দরিয়ায় ভাসমান এক চড়, এককুলকে আশ্রয় দিলে ওকুল ভাসে, ওকুল পানে চাইলে একুল ডোবে। এই অবধারিত দুঃস্থতা অভয় প্রতিকারহীন বিধিলিপির মতোই মেনে নেয়। সেই অদৃশ্য দানব যে এই বিশ্ব সংসারের সকলের গলা চেপে রেখেছে তার কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছে। পরিবারের প্রতি কর্তব্যবোধে ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দ্যকে ভাসিয়ে দিয়ে সে বেরিয়ে পড়েছে নতুন জীবনের সন্ধানে। এখানেই অভয় চরিত্রের সার্থকতা, সাহিত্যের সার্থকতা। যা ভারতীয় ঐতিহ্য, ভারতীয় আদর্শ তা অভয় চরিত্রের মধ্যে দিয়ে কোথাও ক্ষুণ্ণ হয়নি।

সংসার বাসনার সুপ্ত কামনা যে রুদ্ধ যৌবনের দ্বারে দ্বারে কড়া নেড়ে ফেরে আলোচ্য গল্পে তার একটা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত গল্পকার অভয় ও তিন বোনের সংসার বাসনার মধ্যে দিয়ে উপস্থাপন করেছেন। সেই বাসনার বর্ণনা গল্পকার খুব সুন্দরভাবে এঁকেছেন –

“পুকুর থেকে ফেরার পথে ওদের হাতের আলোটা কি করে উঁচু হয়ে ওঠে, দক্ষিণের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়ে অভয়ের ঘরে, তার গায়ে।”^{১৭}

অভয়কে কেন্দ্র করে তাদের দৃষ্টি অর্থাৎ আশা, স্বপ্ন যে আবর্তিত তা অভয়ের অজানা নয়। সেই জন্যই তিন জোড়া চোখের দৃষ্টি তার গায়ে ফুটছে একথা জানার পরেও অভয় মটকা মেরে পড়ে থাকে। শুধু মটকা মেরে পড়ে থাকেই না, সেই সঙ্গে নিজের অন্তরের সুপ্ত সংসার বাসনার দিকেও সে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে যায় এবং তিন বোনকে সেই পথের সহযাত্রী করে তোলে। এক অমোঘ আকর্ষণে তারা পরস্পর পরস্পরের অতৃপ্তি পূরণের মাধ্যম হয়ে ওঠে।

নারী সাংসারিক কর্মক্ষেত্রে দায়িত্ব পালনের মধ্যে নিজেকে উজাড় করে দিয়ে নিজেকে পূর্ণ করে পায়। অভয় তার রান্না খাওয়া, জামাকাপড় কাচার সমস্ত দায়িত্ব তিন বোনের হাতে ছেড়ে দিয়ে তাদের অন্তরের অতৃপ্তি পূরণের সুযোগ করে দেয়। খেলাঘর বেঁধে সংসার বাসনার সাধ মিটলেও অন্তরের অতৃপ্ত কামনা অপূরিত থেকে যায়।

“সবটুকু করেও তাদের তৃষ্ণার্ত গুপ্ত সাধ মিটতে চায় না।”^{১৮}

এখানেই রয়েছে অন্তরের সুপ্ত কামনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তী সাহিত্যে দেহোত্তীর্ণ প্রেম ধারার পরিবর্তে দেহনির্ভর প্রেম-চেতনা ও যৌবনের নিষিদ্ধ কৌতুহল চরিতার্থতার চিরন্তন আকাঙ্ক্ষা উপস্থাপিত হয়। অন্তরের সুপ্ত কামনা মানুষের জৈবিক প্রবৃত্তির বশবর্তী। মানুষের অন্তরের জৈব প্রবৃত্তিগুলি চিরস্থায়ী, কারণ তা সহজাত। সাহিত্য যেহেতু মানব জীবনের প্রতিবিম্ব, তাই মানব জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এই জৈবিক প্রবৃত্তিও সাহিত্যে প্রতিবিম্বিত হয়। কখনো তা থাকে প্রত্যক্ষভাবে কখনো বা প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিতে। আমাদের আলোচ্য অকাল বসন্ত গল্পে জৈবিক প্রবৃত্তির প্রচ্ছন্ন আভাস রয়েছে। সেই সহজাত প্রবৃত্তি তিন বোনের কণ্ঠে উপচে পড়ে –

“বনের আগুন সবাই দেখে,

মনের আগুন কেউ না দেখে,

সে পোড়াতে হয়েছি অঙ্গার।”^{১৯}

সেই আগুনের চোরা স্রোত তাদের শরীর জুড়ে বয়ে যায়। “নিমির বুকের শিরা উপশিরায় টান পড়ে। মনে হয় শরীরটা টলছে। তার শুধু বুক নয়, শুন্য কোলটাও হাহাকার করে।” আবার “বিনির বুকের মধ্যে রক্তের ঢেউ তোলে পাড়াচাপা গুমরানি।” অন্যদিকে “টুনির চোখের পাতা ভারি হয়ে আসে, অবশ হয়ে আসে সমস্ত শরীর।”^{২০} তারা সকলেই সহজাত

প্রবৃত্তির বশবর্তী। মাতৃহের স্বাদ বঞ্চিত, সংসারসুখ বঞ্চিত, প্রেম বঞ্চিত নারী হৃদয়ের অন্তর বেদনার মূলে রয়েছে সহজাত প্রবৃত্তি।

আলোচ্য ‘অকাল বসন্ত’ গল্প এক স্বপ্নভঙ্গের বেদনা মথিত গল্প। আলোচ্য গল্পের প্রত্যেকটি চরিত্রের স্বপ্নের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। অভয়কে কেন্দ্র করে বৃদ্ধা ও তিন বোন যে স্বপ্নের জাল বুনতে শুরু করেছিল সেই স্বপ্নের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। সংসার বাসনার যে সুপ্ত কামনা তিন বোনের মধ্যে প্রচ্ছন্ন ছিল তা অভয়ের প্রবেশের সঙ্গে সঙ্গে উন্মুক্ত হয়ে যায়। তাদের দ্বারা যেন আজ বসন্ত জাগ্রত “কবে এসেছে বসন্ত কে জানে। বসন্ত এসেছিল সেই শরতের মেঘলাভাঙা রোদে, হেমন্তের কুয়াশায়, শীতের রুম্মতায়।” হেমন্তের কুয়াশা, শীতের রুম্মতা তাদের মনের বসন্তের প্রবেশপথে বাধা হয়ে উঠতে পারে না। তাদের মনে বসন্ত এসেছে অকাল সময়ে এবং সেই বসন্তের অকাল মৃত্যু ঘটেছে বসন্তের পটভূমিকায়। এখানেই ব্যঙ্গনা। গভীর হতাশার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষও স্বপ্ন দেখে। এই আশা স্বপ্ন জীবনকে বাঁচিয়ে রাখে। বুক ভরা আশা নিয়ে মানুষ খেলাঘর বাঁধে। সমাজ অর্থনীতির সংকটে ক্লিষ্ট মানুষের জীবনেও ফুল ফোটে কিন্তু সেই ফুল রাত্রির নিরলা অন্ধকারে ফোটে আর রাত্রি শেষে দিনের আলো ফোটার আগেই সে অকালে ঝরে পড়ে। দিনের আলোয় বিকশিত হবার সুযোগ থেকে সে বঞ্চিত। এইরকমই এক বঞ্চিত নারী হৃদয়ের বেদনা মথিত গল্প ‘অকাল বসন্ত’।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভয়পদর আশ্রয়ের সন্ধানে যাত্রা দিয়েই গল্পের যাত্রা শুরু। “অবশেষে একটা ঠাই পাওয়া গেল।”^{২২} গল্পের প্রথম বাক্যেই রয়েছে ব্যঙ্গনা। অভয়ের এই আশ্রয় অবশেষ (আপাতত) হলেও গল্পের পরিশেষে দেখা যায় বাকি চরিত্রগুলির কল্পলোকে অভয়ই হয়ে উঠেছিল মূল আশ্রয়। “অবশেষে একটা ঠাই পাওয়া গেল” - গল্পকারের এই উক্তি অভয়ের উদ্দেশ্য হলেও এ যেন গল্পে উল্লিখিত বৃদ্ধার নিরাশ্রয় অন্তরের উৎসস্থল থেকে নির্গত এক নিশ্চিত আশ্রয়ের ব্যাকুলতার প্রকাশ। এই চাপা ব্যাকুলতা তীব্র গুমরানি কান্নায় পর্যবসিত হয়েছে গল্পের পরিশেষে অভয় যখন তার অবশেষ ঠাই পরিত্যাগ করে নতুনের সন্ধানে যাত্রা করেছে। নিরন্তর ঘাত প্রতিঘাত সামলে কর্মের তাগিদে, বাঁচার তাগিদে সম্মুখ সমরে এগিয়ে যাওয়াই তো জীবন। অভয় সেই জীবনসন্ধানী। বৃদ্ধাও সেই জীবনসন্ধানী। জীবনকে ভাবনা মুক্ত করার আশ্রয়স্থল হিসাবে সে অভয়কেই নির্বাচন করেছিল এবং সেটা তার জীবনের অবশেষ সম্বল। সেই ব্যঙ্গনা দিয়েই গল্পের সূত্রপাত।

যা বৃদ্ধার জীবনের মুক্তি পথে বাধা সেই গলায় ও বুকে বিঁধে থাকা কাটার মত যা অমৃত নয়, গরল নয় সেই আগলে থাকা গচ্ছিত সম্পদের দায়ভার অভয়ের হাতে তুলে দিয়েই জীবনের ভাবনা থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছে। তাই বৃদ্ধা বলেছে -

“এই বুক আর গলায় করে আগলে রেখেছি। কোথাও ফেলতে পারিনে, রাখতেও পারিনে। বিষ নয়, মধুও নয়। ভাবি যেদিন আমি থাকবো না।”^{২৩}

অভয় বৃদ্ধাকে তাঁর জীবনের ভাবনা থেকে উন্মুক্ত করতে পারেনি বরং বৃদ্ধাকে নিজের গৃহেই গৃহহীন, নিরাশ্রয়ী করে দিয়ে গেছে। এখানেই গল্পের ব্যঙ্গনা; এখানেই গল্পের সার্থকতা। গল্প যেখানে শেষ হয়েছে সেখানেই শুরু হয়েছে পাঠকের অন্তরের হাহাকার। পাঠক মন স্বকীয় গল্প রচনায় প্রবৃত্ত হয়। গল্পের পরিশেষে পৌঁছেই পাঠক গল্পের প্রথমেই ফিরে আসে। অবশেষ ঠাই সন্ধানী বৃদ্ধার নিশ্চিত আশ্রয়ের খোঁজে আর পাঠকের অন্তরে চলতে থাকা সেই অতৃপ্তি যা ছোট গল্পের সর্বশেষ এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বৈশিষ্ট্য সেই অতৃপ্তি পূরণের সোপান হিসেবে স্বকীয় রচনায় প্রবৃত্ত হয়ে আলোচ্য গল্পের প্রথম বাক্য পাঠক মন নিজের মনে মনে রচনা করে - “অবশেষে একটা ঠাই পাওয়া গেল”। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় প্রকৃতপক্ষে নারীর সেই ঠাই জোটে না প্রেমেন্দ্র মিত্র রচিত ‘তেলেনাপোতা আবিষ্কার’ গল্প তারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। এ গল্পেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। বিশিষ্ট সমালোচকের ভাষায়-

“...নারী সম্পর্কে একবিংশ শতাব্দীর উষালগ্নে যে দৃষ্টিকোন নীতি গতভাবে সর্বস্বীকৃত সেই বিন্দুতে জীবনদ্রষ্টা সমরেশ বসু উপনীত হতে পারেননি। নারীর এবং নারী-পুরুষের সম্পর্কের যে চিত্র তিনি আমাদের দিয়ে গেছেন তা কোনো নীতিবাদীর সমাজ শাসন নয়, অর্জিত অভিজ্ঞতার সারসত্যই তিনি

আমাদের দিয়ে গেছেন। তাঁর অভিজ্ঞতা সম্ভবত সেরকমই ছিল যা তিনি আমাদের দেখিয়েছেন। সমরেশ বসু বাস্তবের লেখক, আদর্শ প্রচারক নন।”^{২৪}

বৈষ্ণব পদকর্তার সুর আধুনিক গল্পকারের কণ্ঠেও ধ্বনিত। টুনি, বিনি, নিমির অন্তরের আকুলতা, হাহাকার, বেদনা একাকার হয়ে গেছে রাধার সঙ্গে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে বড়াই এর উদ্দেশ্যে রাধার উক্তি –

“আকুল করিতে কিবা আশ্কার মন।

বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন।।”^{২৫}

তাদের তিন বোনের কণ্ঠে যেন রাধারই সেই বেদনা পতিধ্বনিত –

“আর রইতে নারী হয়ে নারী

তোমার বাঁশি শুনে গো

আর চলতে নারী হয়ে নারী

একি বিষম দায় গো।”^{২৬}

তারা যেন আধুনিক রাধা।

গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র অভয়ের যাত্রা ঘটেছে কর্মের তাগিদে, নতুন করে বাঁচার সন্ধানে; নতুন আশ্রয়ও তার নিশ্চয় মিলবে। কিন্তু অভয় চলে যাওয়ায় বৃদ্ধার এই অবশেষ সম্বলহীন জীবনে তীব্র গুমরানি চাপা কান্নাই তার সম্বল।

“একটা চাপা তীব্র গুমরানি শুনে তিন বোন ফিরে দেখলো দেয়ালের নোনা ইটে মুখ চেপে কাঁদছে বুড়ি মা।”^{২৭}

পাঠককে সেই দৃশ্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে লেখক অন্তর্ধান করেন। পাঠক মনে চলতে থাকে গল্পের পুনঃপাঠ। পাঠক মন অন্তরের ক্ষণিক তৃপ্তি মেটানোর জন্য অবশেষে একটা ঠাই পাওয়া গেল এই বাক্যকে যতই আগু বাক্য মনে করুক না কেন জানে প্রকৃতপক্ষে অবশেষে ঠাই সেই বৃদ্ধার মিলবে না। বৃদ্ধার শেষ বয়সের স্বপ্নের অকাল মৃত্যু ঘটেছে। তাই বুড়ির জীবনেও অভয়ের আগমন অকাল বসন্তের মতোই এবং অভয়ের চলে যাওয়াও সেই অকাল বসন্তের অকাল মৃত্যু ঘটেছে।

Reference:

১. বসু, সমরেশ শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৯
২. তদেব, পৃ. ৯
৩. মোহাম্মদ, দোস্ত সম্পাদিত, আধুনিক ছোটগল্প মনে ও মননে, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১১, পৃ. ৪০৫
৪. বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদুতি: প্রসঙ্গ উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপভেদ, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৩. প্রকাশক শুভেন্দু মিশ্র, 319/75 যশোর রোড, কলিকাতা, পৃ. ২৫১
৫. মোহাম্মদ, দোস্ত সম্পাদিত, আধুনিক ছোটগল্প মনে ও মননে, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১১, পৃ. ৪০৫
৬. নাথ, ড. রণবীর সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা ছোটগল্প চৈতন্য বিচিত্র সরণী, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৭১
৭. তদেব, পৃ. ৭১
৮. বসু, সমরেশ শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৩১
৯. তদেব, পৃ. ৩২
১০. তদেব, পৃ. ৩৬
১১. তদেব, পৃ. ৩৭
১২. তদেব, পৃ. ৩৫
১৩. তদেব, পৃ. ৩৭
১৪. তদেব, পৃ. ৩৬

১৫. তদেব, পৃ. ৪৩

১৬. তদেব, পৃ. ৩৫

১৭. তদেব, পৃ. ৩৬

১৮. তদেব, পৃ. ৪১

১৯. তদেব, পৃ. ৩৭

২০. তদেব, পৃ. ৪১

২১. তদেব, পৃ. ৪৩

২২. তদেব, পৃ. ৩১

২৩. তদেব, পৃ. ৩৫

২৪. নাথ, ড. রণবীর সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা ছোটগল্প চেনার বিচিত্র সরণী, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ২০১১, পৃ. ৭২

২৫. চট্টোপাধ্যায়, ড. অশোক সম্পাদিত, বড় চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সন্দর্শন, ইউনাইটেড বুক এজেন্সি, কলকাতা,-১, প্রথম প্রকাশ ১৪৩০. পৃ. ৪৮১

২৬. তদেব, পৃ. ৪২

২৭. তদেব, পৃ. ৪৪

Bibliography:

আকর গ্রন্থ :

বসু, সমরেশ, শ্রেষ্ঠ গল্প, প্রমা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ বইমেলা জানুয়ারি ১৯৮৬, পৃ. ৩১-৪৪

সহায়ক গ্রন্থ :

নাথ, ড. রণবীর সম্পাদিত, আধুনিক বাংলা ছোটগল্প চেনার বিচিত্র সরণী, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ ৩০শে নভেম্বর ২০১১.

বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবদ্যুতি: প্রসঙ্গ উপন্যাস ও ছোটগল্পের রূপভেদ, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ২০০৩. প্রকাশক শুভেন্দু মিশ্র, ৩১৭/৭৫ যশোর রোড, কলিকাতা.

মোহাম্মদ, দোস্ত সম্পাদিত, আধুনিক ছোটগল্প মনে ও মননে, সাহিত্য সঙ্গী, প্রথম প্রকাশ আগস্ট ২০১১,

মুখোপাধ্যায়, ধুবকুমার, বাংলা ছোটগল্পের দিকদিগন্ত, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ বইমেলা ২০১৬, পৃ ৬৪৬।

মজুমদার, উজ্জ্বলকুমার, গল্পচর্চা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯, তৃতীয় সংস্করণ কলকাতা বইমেলা ২০১৮

নাগ, দীপালি, এবং মানুষ সমরেশ বসুর গল্প, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রকাশ রাসযাত্রা ১৪১২.

চট্টোপাধ্যায়, সত্যচরণ, বাংলা ছোটগল্পের ক্রমবিকাশ, প্রজ্ঞাবিকাশ, প্রথম প্রকাশ ২৬শে জুন, ১৯৯৮

বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রনাথ, ছোটগল্পের মণিমুক্তা ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ৭০০০০৯, প্রথম প্রকাশ কলকাতা বইমেলা ২০১১